Vol. 35 | No. 2 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুল কাব্যে পুরাণের ব্যবহার

Volume	35
Issue	2
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
Published online	February 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i2.2
Pages	৩১-৬০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুল কাব্যে পুরাণের ব্যবহার

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

পুরাণ এই শব্দের মধ্যেই আছে কাহিনীগুলোর প্রাচীনত্বের সংবাদ। ব্যাস এবং অন্যান্য মুনি ঋষিদের দ্বারা রচিত পুরাতন শাস্ত্রীয় কাহিনীই পুরাণ। পুরাণ শাস্ত্র বটে--কাব্যও বটে। পুরাণের লক্ষণ পাঁচটি:

> সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ- বংশানু
> চরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম।

একথা অনস্বীকার্য, আদিম মানব সমাজেরই সৃষ্টি এই পুরাণ কাহিনী। তাই আজকের বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকের কাছে পুরাণের কাহিনী অলৌকিক মনে হতে পারে। তবে আধুনিক কালের রসিক মানুষের কাছে এই পুরাণের তাৎপর্য ভিন্ন রকমের। মানুষের মন তো অতল সমুদ্রের মতো সীমাহীন--মনের সীমাহীন বিচিত্র অনুভূতিকে এক কালে মানুষ পুরাণের মধ্যে রূপ দিতে চেষ্টা করেছে। আধুনিক কালের মানুষ এই পুরাণের ব্যবহৃত কাহিনীকে তার তাৎপর্যকে তার সৃষ্ট কাব্যে সাহিত্যে এক নূতন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করেছে।

আমরা দেখেছি বাংলা কাব্যে মধুসূদন প্রথম পুরাণের ব্যবহার সার্থকভাবে করেছিলেন। তারপর করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আধুনিক মন-

মানসের অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই তাঁর কাব্যে পুরাণের ব্যবহার শুধু অতীতের কাহিনীমাত্র নয়। আধুনিক জীবনের ইঙ্গিতও আছে তাঁর পুরাণের ব্যবহারের মধ্যে। রবীন্দ্রকাব্যে পুরাণের ব্যবহার পরিমাণগত দিক থেকে খুব বেশী নয়। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে নজরুল ইসলামের কাব্যে পুরাণের ব্যবহার অনেক গুণ বেশী। বস্তুত নজরুলের সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিদের মধ্যে পুরাণের এত অধিক সংখ্যক প্রয়োগ দেখা যায় না বলা চলে।

নজরুল ইসলাম বিপ্লবী কবি। তিনি ভাঙতে চান পুরাতনকে। জীর্ণ দীর্ণ যা-কিছু সবকে। একদিকে এই ভাঙনের প্রবল ইচ্ছা বা নেশা আবার সঙ্গে সঙ্গে নবসৃষ্টির প্রেরণা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। এই প্রেরণার প্রতীকী প্রকাশ খুঁজতে গিয়ে তিনি পুরাণের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। পুরাণের কাহিনী বর্ণনা করার জন্য নয়-- পুরাণ কাহিনীর মধ্যে যে ভাবনা যে প্রেরণা--তাকে বর্তমানের কাঠামোতে এনে দাঁড় করানোই তার লক্ষ্য ছিল। যে দেশ ঘুমন্ত--বা অর্ধচেতন তাকে জাগাতে হবে-- যেমন করে নিদ্রিত নারায়ণ ভগবান বিষ্ণুকে বুকে পদাঘাত করে জাগিয়েছিলেন ভৃগু। কাজেই এ সবই হচ্ছে প্রতীক মাত্র। ঘুমন্ত বাঙালী জাতির প্রতি এই আহবান রবীন্দ্রনাথও জানিয়েছিলেন:

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

বলাকা কাব্যের এই বাণী--আবাহনের বাণী, তাৎপর্যপূর্ণ বাণী। অবশ্য বলাকা কাব্য আরও কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বাণীর বাহক বটে।

নজরুল ইসলাম জাতিকে একটি আঘাত দেবার জন্য সমগ্র পুরাণ সাহিত্যভাণ্ডার (প্রধানত) রামায়ণ মহাভারত ও অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্যও) নিঃশেষ করে দিয়ে তার মধ্যকার বহু উপমা বহু চিত্রকল্পকে তাঁর কাব্যে উপস্থিত করেছেন। নজরুলের এই পুরাণপ্রীতি বা প্রতীকপ্রীতির কারণসমূহ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলে আমরা কতগুলি ব্যাপার লক্ষ্য করি। জাগরণের জন্য মানুষকে আত্মসচেতন হতে হয়। এই সচেতনতা আসে মানুষ যখন পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি বা পুরাতন আদর্শের প্রতি সচেতন হয় তখনই। এই দেশের সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ হিন্দু মুসলিম জাতির মিলিত অবদান রয়েছে। মুসলমান হয়েও কবি বিস্মৃত হন নি যে এদেশের সংস্কৃতির মূলে রয়েছে হিন্দু বৌদ্ধ সংস্কৃতি। তাই তার পূর্বপুরুষের সংস্কৃতির যা কিছু গৌরবের, যা কিছু মহৎ, তার প্রতি সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। তার অতীত মর্যাদার উপলব্ধি প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা কাজী আবদুল ওদুদ অনেক কাল আগে লিখেছিলেন-''জীবনের সার্থকতাকামী বাঙালী মুসলমানের জন্য তার পরিবেষ্টনের মাধুর্য আর পূর্বপুরুষের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মর্যাদা উপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন। ফেরদৌসী যেমন একান্ত প্রয়োজন বোধ করেছিলেন--তার পূর্বপুরুষের--মহিমার সঙ্গে যোগযুক্ত হবার। এ ব্যাপারটা যেন বৃক্ষের মূল দিয়ে মাটির গভীর রস আহরণ করার মত। ... বাংলার মুসলমান বাংলার হিন্দু থেকে পৃথক--এই আত্মচেতনা মুসলমানকে দিয়েছে আত্মরক্ষার সামান্য শক্তি--অর্থাৎ নিজে কোন রকমে বজায় রাখার শক্তি --কিন্তু মাত্র আত্ম-চেতনা ব্যাধি; আত্মচেতনার সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই-- আত্মবিসর্জনের মত ক্ষমতা। প্রতীক প্রীতির ভিতর দিয়ে নজরুল মুসলমানকে ইঙ্গিত দিয়েছেন--এই আত্মবিসর্জনের দিকে।''

এতক্ষণ আমরা নজরুল ইসলামের পুরাণ ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্যের কথা বললাম-- এছাড়া নজরুলের কি আর কোন উদ্দেশ্য ছিল? এ ব্যাপারটার অনুসন্ধান করা যেতে পারে। শুধু কি রূপকার্থে বা প্রতীকী ব্যঞ্জনার জন্য বা কাব্য সৌন্দর্যের জন্য কবি এগুলি ব্যবহার করেছেন? শুধু মাত্র কাব্য সৌন্দর্য বা বাণী সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল কবির-- এসব প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

প্রথম কথা, বক্তব্যকে সুস্পষ্ট জোরালো এবং মর্মস্পর্শী করে তুলবার জন্য এই পুরাণ প্রসঙ্গ তথা প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। *ভাঙ্গার গান* গাইতে গিয়ে কবি বলেছেন:

গাজনের বাজনা বাজা--কে মালিক? কে সে রাজা
কে দ্যায় সাজা।
ওরে ও পাগল ভোলা-- দেরে দে প্রলয় দোলা।

'পাগল ভোলা' মাত্র একটি কথা দিয়ে কাব্যসৌন্দর্য প্রতীকের ব্যঞ্জনায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। ধ্বংসের বা ভাঙার গানের এর চাইতে সুন্দর আর চিত্রকল্প কি হতে পারে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে কবি লিখেন--*ইন্দ্রপতন*।

"মর্ত্য-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ ইন্দ্র কাছে।" অর্থাৎ দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ একটি বিরাট ঘটনা-- পৃথিবীর ইন্দ্র যেন আজ স্বর্গের দেবতা ইন্দ্রের কাছে চলে গেলেন-- সেখানে তিনি সগর্বে সগৌরবে বিরাজ করবেন। কাজেই পুরাণকে নজরুল ইসলাম ব্যবহার করেছেন তার কাব্যকে শ্রীমণ্ডিত করার জন্য--ভাবকে সুপরিস্ফুট করার জন্য। *চিত্তনামার* আর একটি কবিতা *সান্ত্বনায়* আছে:

মৃত্যু--বাসুদেবের কোলে কারার কেশব ঐ গো যায়

অনাগত বৃন্দাবনে মা যশোদা শাঁখ বাজায় ।

এখানে কৃষ্ণ যশোদা এবং কংশের প্রসঙ্গ এসেছে এই তাৎপর্যকে বুঝাতে যে, কংশের কারাগারেই কংশের নিধনকারী কৃষ্ণ বর্ধিত হচ্ছে। অত্যাচারী নিজেও জানে না যে তারই শাস্তিদানকারী খুব কাছেই আছে। কৃষ্ণের আবির্ভাবের এমন মনোজ্ঞ চিত্র অতি অল্প কথায় এখানে অঙ্কিত হয়েছে আশ্চর্য সুন্দরভাবে।

এবার আমরা নজরুল ইসলামের বিভিন্ন কাব্যে কি কি পৌরাণিক প্রসঙ্গ এসেছে এবং তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি সে সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

পুরাণের সর্বাধিক ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি-- *অগ্নিবীণা* কাব্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমরা এখানে শুধু এদেশীয় ভারতীয় পৌরাণিক প্রসঙ্গ সম্পর্কেই আলোচনা করবো। নজরুল ইসলামের কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহারও আছে-- সে আলোচনা ভিন্নভাবে অন্যত্র করা যাবে। এখানে 'পুরাণ' অর্থাৎ এতদ্দেশীয় ঐতিহ্যকে আলোচ্য বিষয় হিসাবে নেওয়া হয়েছে।

প্রধানত যুদ্ধ, বিদ্রোহ, প্রেম, বিরহ-অনুভূতি প্রকাশার্থে এসব প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। *অগ্নিবীণার* যে সকল কবিতায় পুরাণ প্রসঙ্গ এসেছে সেগুলি হলো-- *বিদ্রোহী, রক্তাম্বরধারিণী মা, আগমনী, ধূমকেতু, প্রলয়োল্লাস*। নজরুল ইসলাম এই বইটি উৎসর্গ করেছিলেন- শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে। যিনি হচ্ছেন, ''ভাঙ্গা বাংলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর।'' উৎসর্গে একটি কবিতাও

আছে। সে কবিতায়ও 'বংশীধারী', 'দুর্বাসা' এই দুটি প্রসঙ্গ আছে পুরাণের। *বিদ্রোহী* কবিতায় আছে অনেক প্রসঙ্গঃ যেমন, রুদ্র ভগবান, নটরাজ, জমদগ্নি, ভৃগু, ব্যোমকেশ, পিনাকপাণি, ধর্মরাজ, দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র, বাসুকি, পরশুরাম, বিষ্ণু, যুগলকন্যা চণ্ডী।

বিদ্রোহী কবিতার মূল কথা হচ্ছে প্রচলিত সমাজ ও নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ। সেই জন্য এ কবিতায় পুরাণের ব্যবহার খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। সে জন্য কবি নিজেকে একজন বিদ্রোহী প্রতিবাদী রূপে চিহ্নিত করতে চান--একজন কঠোর-প্রলয়ঙ্করী ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা করেন। তাঁর এই রুদ্রকঠোর রূপকে সুপরিস্ফুট করার জন্যই তিনি কখনো 'রুদ্র' রূপে আবির্ভূত কখনো তিনি পরশুরামের মত নিষ্ঠুর ও কর্তব্যপরায়ণ হতে চান। আমরা এখন এই পৌরাণিক চরিত্রসমূহের কার্যকলাপের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করবো। এই চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হলে কবি নজরুল ইসলামের কাব্যও বুঝা সহজ হবে।

এখানে কয়েকজন পৌরাণিক চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

রুদ্র-- ঋগ্বেদে অগ্নিকে রুদ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ যজুর্বেদে ধ্বংসাত্মক দেবতা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। রুদ্র একাধারে ভয়াল ও মঙ্গলময়ও। (মঙ্গলময় রূপে তিনি 'শিব')।

পিনাকপাণি-- মহাদেবের অপর নাম পিনাকপাণি। শিবের ধনু ও বাদ্যযন্ত্রই পিনাক। মহাদেব যুদ্ধকালে এর দ্বারা শর নিক্ষেপ করেন। এবং অন্য সময়ে বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন।

নটরাজ— নৃত্যকলার উদ্ভাবন করেছেন বলে মহাদেবের নাম নটরাজ। বিশ্ব ধ্বংসের কালে তাঁর নৃত্যকে তাণ্ডব বলা হয়।

ব্যোমকেশ— স্বর্গ থেকে গঙ্গাবতরণকালে শিবের জটাসমূহ আপামর ব্যাপ্ত হয়ে যায়, সেই কারণে মহাদেবের অপর নাম ব্যোমকেশ।

দুর্বাসা— মহর্ষি অত্রির ঔরসে জন্ম। অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন। অনেকেই তার কোপানলে দগ্ধ হন।

পরশুরাম— জমদগ্নি ও রেণুকার পুত্র এবং বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। জমদগ্নির স্ত্রী রেণুকা রাজা চিত্ররথকে দেখে কামার্ত হয়ে পড়াতে জমদগ্নি তার চার পুত্রকে মাতৃহত্যার আদেশ দেন। চারপুত্র অস্বীকৃতি জানালে পঞ্চম পুত্র পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য করে কুঠারাঘাতে মায়ের শিরচ্ছেদ করেন। ক্ষত্রিয়দের প্রতিও পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজা কার্তবীর্য জমদগ্নির হোমধেনুর বৎস হরণ করেন এবং তারপর পরশুরাম কার্তবীর্যকে হত্যা করেন। কার্তবীর্যের পুত্রেরা একদিন তপস্যারত জমদগ্নিকে হত্যা করেন। পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে মৃত পিতাকে দেখে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি কার্তবীর্যের পুত্রদের হত্যা করে সমস্ত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করবেন। তিনি একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। পরে পিতামহ ঋচীকের অনুরোধে ক্ষত্রিয় হত্যা থেকে নিবৃত্ত হন।

জমদগ্নি— ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে বশিষ্ঠের সঙ্গে বিরোধে বিশ্ব মিত্রের শতপুত্র বশিষ্ঠ কর্তৃক নিহত হয়।

ভৃগু—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই মীমাংসার জন্য ঋষিগণ ভৃগুকে প্রথম ব্রহ্মার কাছে পাঠালেন। ভৃগু ইচ্ছা করেই ব্রহ্মাকে সম্মান করলেন না। এতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হন; পরে ভৃগু তাকে অনেক স্তব স্তুতি করে শান্ত করে শিবের কাছে যান। শিবকে সম্মান না দেখানোর ফলে শিবও ভৃগুর প্রতি রুষ্ট হন। স্তব দ্বারা শিবকে তুষ্ট করে ভৃগু বিষ্ণুর কাছে যান। বিষ্ণুকে নিদ্রিত দেখে ভৃগু বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করেন। বিষ্ণু নিদ্রা থেকে জেগে ভৃগুর পদসেবা করতে থাকেন। ভৃগুর পায়ে কোন আঘাত লেগেছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করেন। তখন ভৃগু সিদ্ধান্ত নিলেন যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ দেবতা--তারপর থেকে বিষ্ণুবক্ষে ভৃগুর পদচিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে।

ভৃগু ব্রহ্মার মানসপুত্র। ভৃগু সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

বাসুকি--দক্ষকন্যা কদ্রুর পুত্র। পিতা মহর্ষি কশ্যপ। ইনি নাগরাজ। সমুদ্রমন্থন কালে নাগরাজ বাসুকিকে মন্থন রজ্জুরূপে ব্যবহার করা হয়। সহস্র বৎসর মন্থনে কিছু না পাওয়াতে নাগরাজ বিষ উদ্গীরণ করতে থাকে। বিষে সমস্ত পৃথিবী ভেসে যাচ্ছিল দেখে মহাদেব সমস্ত বিষপান করে ফেললেন। বাসুকির মাতা কদ্রু সপত্নী বিনতাকে দাসী করবার জন্য সর্পপুত্রদের সহায়তা চান। যারা সাহায্য করে নি তাদেরকে কদ্রু অভিশাপ দেন। ব্রহ্মা তখন তাকে পাতালে গিয়ে চঞ্চলা পৃথিবীকে নিশ্চলভাবে ধারণ করতে বললেন।

বিষ্ণু— নারায়ণ, ইনি সৃষ্টির পালক। লক্ষ্মী ও সরস্বতী এর স্ত্রী। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য দেবতাদের সাহায্যের জন্য এবং দানব দমনের জন্য ইনি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। এর চারটি হস্ত--এক হস্তে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, দ্বিতীয় হস্তে সুদর্শন চক্র, তৃতীয় হস্তে গদা, চতুর্থ

হস্তে পদ্ম। দৈত্য দানব দমন করার জন্য এই সুদর্শন চক্র ব্যবহার করা হয়।

ছিন্নমস্তা—— ইনি চণ্ডিকা নামে খ্যাত। দেবী দুর্গার মূর্তি। এই মূর্তিতে

দেবী মহিষাসুর বধ করেন। ইনি বামহস্তে মস্তক ধারণপূর্বক জিহবা দ্বারা নিজের কণ্ঠ নিঃসৃত রক্তধারা পান করেন।

উচ্চৈঃশ্রবা—— দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে সমুদ্র থেকে শ্বেত অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা উদ্ভূত হয়। এটি ইন্দ্রের অশ্ব। এই অশ্ব অমৃত পান করতো এবং অশ্বদের মধ্যে একে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়।

বলরাম—— শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এর অস্ত্র হল। গদাযুদ্ধে ইনি অদ্বিতীয়।

বিদ্রোহী কবিতার পরে *রক্তাম্বরধারিণী মা* কবিতায় যে সব পৌরাণিক প্রসঙ্গ এসেছে সে সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে।

রক্তাম্বরধারিণী মা হলেন চণ্ডিকা। মহিষাসুর প্রভৃতি দানবদের বধ করার জন্য ইনি প্রসিদ্ধ। দানবরাজ রম্ভের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ চিতায় স্থাপন করা হয়। তার স্ত্রীও সহমরণে চিতারোহণ করেন। অগ্নিসংযোগ কালে রম্ভের স্ত্রীর উদর থেকে মহিষাসুরের জন্ম হয়। তখন রম্ভও রূপান্তর গ্রহণ করে চিতা থেকে উঠে আসে এবং রক্তবীজ নামে খ্যাত হয়। যুদ্ধে আহত রম্ভের দেহের রক্তবিন্দু মাটিতে পড়লেই তা থেকে রক্তবীজের মত ভয়ঙ্কর সহস্র বীরসেনার জন্ম হতে থাকে। তখন দেবী মহাশক্তি কালীরূপে আবির্ভূত হলেন এবং রসনা বিস্তার করে সমস্ত রক্তবীজের বা দানবদের শোণিত পান করে তাদের পরাস্ত করেন।

দণ্ডপাণি-- যম, ইনি সর্বদা দণ্ড হস্তে বিরাজ করেন।

দধীচি-- অথর্ব মুনির ঔরসে শান্তির গর্ভে এর জন্ম। বৃত্রাসুরের আক্রমণে উৎপীড়িত ও স্বর্গচ্যুত দেবতারা জ্ঞাত হন যে দধীচির অস্থিনির্মিত অস্ত্রে বৃত্রের নিধন সম্ভব। তখন তারা দেবতা ইন্দ্রের কাছে গিয়ে দধীচির অস্থি প্রার্থনা করেন। দধীচি দেবতাদের উপকারার্থে প্রাণ বিসর্জন দেন। ইন্দ্র সেই অস্থিদ্বারা বজ্র নির্মাণ করেন এবং বৃত্রদের সংহার করেন।

আগমনী কবিতাটিতে পুরাণের ব্যবহারের চাইতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ বাহুল্য দেখা যায়। দু'একটি উদাহরণ দিলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমন দমকি দমকি, ধমকি ধমকি, দ্রিমি দ্রিমি, গমকি গমকি, চমকি চমকি, থনখন, ঝন ঝন, ঘর ঘর, হন হন, শন শন, তা তা থৈ থৈ ইত্যাদি। এগুলি অবশ্যই পৌরাণিক দেবাসুরদের নানা ক্রিয়াকলাপের সংগে সম্পর্কযুক্ত।

মহাকাল-- শিবের অন্য নাম।

ভৈরব-- অন্ধকাসুরের সঙ্গে মহাদেবের যখন যুদ্ধ হয়, তখন অন্ধক মহাদেবের মস্তকে পদাঘাত করলে তা চারটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং রক্ত প্রবাহিত হয়। এই রক্তধারাই ভৈরব।

বরুণ-- ইনি দশ দিকপালের অন্যতম ও একজন লোকপাল তিনি জলের দেবতা নামেও খ্যাত। সূর্য তার নেত্র, সুবর্ণময় তার রথ বেদে বরুণ সহস্রলোচন বলে কথিত। ঋকবেদে আকাশ ও সমুদ্রের মিলন রেখাতে বরুণের অবস্থিতি কল্পনা করা হয়েছে।

ধূর্জটি--শিব।

কমলা—সমুদ্রমন্থনে অপ্সরাদের উদ্ভব হওয়ার পর চারিদিক আলো করে বিদ্যুৎমালার মতো দেবী কমলা সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হন। ঋষিরা তাকে অভিষেক করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেবশ্রেষ্ঠ মুকুন্দকেই বরণ করেন।

গণেশ— শিব ও পার্বতীর পুত্র। গণেশ সিদ্ধিদাতা। সকল ক্রিয়াকর্মের শুরুতে গণেশের পূজা করা হয়। তার দেহ খর্বাকৃতি; চারি হাত, ত্রিনয়ন এবং মস্তক হস্তীর ন্যায়। বহু বৎসর সন্তান না হওয়ায় পার্বতী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পুণ্যকব্রত করায় যথাসময়ে পার্বতীর পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে দেবতাদের সঙ্গে শনিও দেখতে আসেন। শনির স্ত্রী শনিকে অভিশাপ দেন---শনি যার দিকে তাকাবে তার বিনাশ হবে--শনি গণেশকে দেখতে এসে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকে। পার্বতী বারবার তাকে তার পুত্রের মুখ দেখতে বলেন। শনি গণেশের মুখ দেখা মাত্র গণেশের মুণ্ড দেহচ্যুত হয়। তখন বিষ্ণু পথে একটি নিদ্রিত হস্তী দেখতে পেয়ে তার মুণ্ড এনে গণেশের দেহে সংযোজিত করেন।

মহেশ—শিব।

ধূমকেতু কবিতার প্রথমেই আছে শনির কথা। সূর্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে শনির জন্ম। শনি ধ্যানমগ্নকালে তার স্ত্রী তাকে কামনা করলে শনি তার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। এ জন্য তার স্ত্রী তাকে অভিশাপ দেন যে শনি যার দিকে তাকাবে সে বিনষ্ট হবে। গণেশের মুণ্ডচ্যুতির কারণ শনির দৃষ্টি।

ভবানী—দুর্গা।

বৈশ্বানর— বৈশ্বানর বা অগ্নি ঋকবেদে একজন প্রধান দেবতা।

দেবরাজ—— ইন্দ্র।

দম্ভোলি—— বজ্র।

কালনাগ—— মহাক্ষতিকর নাগ। নাগের জন্মস্থান পাতাল। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে কশ্যপের জন্ম হয়। কশ্যপের কদ্রু নামে এক স্ত্রী ছিল। কদ্রুর গর্ভে কয়েকজন পরাক্রান্ত পুত্রের জন্ম হয়। এদের নাম অনন্ত, বাসুকি, কম্বল, শঙ্খ ইত্যাদি। এদের পুত্র পৌত্রাদিতে ক্রমশ পৃথিবী নাগ পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। এই নাগেরা অতি কুটিল বিষপূর্ণ ছিল। নাগের অত্যাচারে যখন পৃথিবীর মনুষ্য বিনষ্ট হতে থাকে তখন তারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। তখন তাদের জন্য পৃথক বাসস্থান নির্ধারিত হয়।

রণ ভেরী কবিতায় আছে খাণ্ডবদাহের প্রসঙ্গ।

পাণ্ডবগণ যমুনা তীরে খাণ্ডবপ্রস্থে ইন্দ্রপস্থ নামে নগর স্থাপন করেন এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। একদিন যমুনা তীরে কৃষ্ণ ও অর্জুন পানাহার করছিলেন--এমন সময় অগ্নি খাণ্ডব দগ্ধ করতে আসে। শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে দ্বাদশ বৎসর ঘৃত পান করায় তার অগ্নিমান্দ্য হয়। তখন ব্রহ্মা তাকে বলেন--খাণ্ডববন দগ্ধ করে সেখানকার প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ করতে হবে--খাণ্ডববন ইন্দ্রের প্রিয় ছিল। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ ও অর্জুন অগ্নির সাহায্যে এগিয়ে আসেন। পনের দিন ধরে অগ্নি খাণ্ডববন দগ্ধ করতে থাকে। সেখানকার প্রাণীর মধ্যে ময়দানব, অশ্বসেন ও চারিটি মাত্র শার্ঙ্গক পাখী রক্ষা পায়।

নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *দোলন চাঁপায়*ও পুরাণের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। *ব্যথাগরব* কবিতায় আমরা বিষ্ণু, ভৃগু,

কৌস্তুভমণির উল্লেখ দেখি। ভৃগুর উল্লেখ আমরা *বিদ্রোহী* কবিতায় পেয়েছি। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাতে গেলে ভৃগুর মত হ্তে হবে। *বিদ্রোহী* কবিতায় ধ্বংস, বিদ্রোহ ও বীরত্বের কথা আছে। শুধু ধ্বংস নয় সৃষ্টির কথাও আছে। *অগ্নিবীণাতে* বিদ্রোহ ধ্বংস আর *দোলন চাঁপায়* আছে প্রেমের কথা, প্রেমের ব্যথা বেদনার কথা, মান অভিমান বিরহের কথা।

কৌস্তুভ— বিষ্ণুর বক্ষস্থ মণির নাম হচ্ছে 'কৌস্তুভ'।

সাধের ভিখারিণী কবিতায় আছে সতী অন্নপূর্ণার কথা। সতী শিবের স্ত্রী এবং দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। দক্ষের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত না হওয়ায় সতী শিব দু'জনাই ক্রুদ্ধ হন। দক্ষ শিবের নিন্দা করাতে সতী পিতৃগৃহে দেহত্যাগ করেন। শিব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেন। তখন বিষ্ণু চক্রদ্বারা সতীর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করতে থাকেন। সতী পরে হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে পার্বতী নামে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন। পার্বতী তপস্যার দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করে শিবের সঙ্গে মিলিত হন। শিব সর্ব ত্যাগী সন্ন্যাসী--মহাযোগীর বেশে তিনি দিগম্বর ধূর্জটি; তাঁর দেহ ভস্মাবৃত ও জটাজূটধারী। এহেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকেই সতী বিবাহ করেন। সতী নিজে কিন্তু অন্নপূর্ণা।

বনমালী— কৃষ্ণ। *বনমালী* কবিতায় আছে ''ভুল করিলে বনমালী এসে বনে ফুল ফোটাতে।'' কৃষ্ণ বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। শ্মশানচারী হচ্ছেন 'শিব'। *'কার বাঁশী বাজিল'* কবিতাতে কৃষ্ণের বাঁশির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বাঁশি বাজিয়ে ভগবান ভক্তকে আহ্বান করেন। শ্যাম হচ্ছেন কৃষ্ণ। *রৌদ্রদগ্ধের গানে* রাধার প্রসঙ্গও এসেছে। রাধা কৃষ্ণের প্রেমিকা, রাধা ভক্তের প্রতীক। বৃষভানুর ঔরসে কলাবতীর গর্ভে

রাধার জন্ম। আয়ান ঘোষের সঙ্গে এর বিবাহ হয়। ঈশ্বর জ্ঞানে রাধা কৃষ্ণকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধার উল্লেখ আছে। গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হতে রাধা উদ্ভূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজা শুরু করেন। 'রা' অর্থ মুক্তি লাভ করা এবং 'ধা' অর্থ ধাবমান হওয়া-- অর্থাৎ হরির পদে ধাবমান হওয়া।

নজরুল ইসলামের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *বিষের বাঁশীতে* অনেক পৌরাণিক প্রসঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথমে *জাগৃহি* কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। *অগ্নিবীণার বিদ্রোহী* কবিতার সঙ্গে *জাগৃহি* কবিতার তুলনা করা যেতে পারে। *বিদ্রোহী* কবিতায় শিবের তাণ্ডব নৃত্য, ধ্বংসের কথা এবং সর্ব সংহারিণী চণ্ডীর প্রসঙ্গ এসেছে। *জাগৃহি* কবিতায়ও তাই। শঙ্কর--মহেশ্বর ক্ষিপ্ত হয়েছেন আর ছিন্নমস্তা চণ্ডী চামুণ্ডার ধ্বংসকারিণীর রূপ অঙ্কিত হয়েছে এই *জাগৃহি* কবিতায়।

বৈশ্বানর-- অগ্নি, ঋকবেদের প্রধান দেবতা। বিশ্বামিত্র এই দেবতার স্তুতি করে অনেক ঋকমন্ত্র রচনা করেন। পার্বতী বা গৌরী হচ্ছেন হৈমবতী।

অগস্ত্য-- ইনি বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইনি মিত্র অর্থাৎ তেজোময় সূর্য ও বরুণের পুত্র। অগস্ত্য বিন্ধ্য পর্বতের গুরু ছিলেন। সূর্য যেমন উদয়াস্তকালে সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করে সেই রূপ বিন্ধ্য পর্বতও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবেন। সূর্য এতে অসম্মত হলেন। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বিন্ধ্য নিজের দেহের বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং সূর্যের পথ রোধ করেন। তখন দেবতারা ভীত হয়ে অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলেন। অগস্ত্য বিন্ধ্যের কাছে উপস্থিত হলে বিন্ধ্য অবনত মস্তকে তাকে প্রণাম করলেন। অগস্ত্য বললেন-- আমি যতক্ষণ না প্রত্যাবর্তন করি ততক্ষণ

তুমি এভাবে মস্তক নত অবস্থায় থাক। পয়লা ভাদ্র বিন্ধ্যকে এমতাবস্থায় রেখে অগস্ত্য দক্ষিণা পথে যাত্রা করলেন এবং আর ফিরলেন না। এভাবে দেবতারা বিন্ধ্যকে দমন করেছিলেন।

কার্তিক-- মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র।

স্বাহা-- অগ্নির স্ত্রী। ব্রহ্মা হতে উদ্ভূত অর্ধ নারী অংশ স্বাহা--মুনি

ঋষিরা এবং ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করেন--যজ্ঞে হবি দান করেন।

উমা-- পার্বতীর অপর নাম।

ঝড় কবিতায় উল্লেখ আছে অক্ষৌহিণী সেনার, প্রহলাদ, তক্ষক, কদ্রু এবং জনমেজয়-এর।

অক্ষৌহিণী-- যে সেনাদলে ১০৯,৩৫০ জন পদাতিক, ৬৫,৬১০টি অশ্ব, ২১৮৭০টি হস্তী, ২১৮৭০টি রথসহ মোট ২১৮৭০০ সৈন্য থাকে-- অর্থাৎ বিশাল সেনাবাহিনী।

প্রহলাদ-- দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ও কয়াধুর কনিষ্ঠ পুত্র। জয় ও বিজয় শাপগ্রস্থ হয়ে তিনবার নারায়ণের শত্রু রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিজয় হিরণ্যকশিপু রূপে জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যকশিপু শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ডামর্কের হাতে প্রহলাদের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। প্রহলাদ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন--কিন্তু হিরণ্যকশিপু ছিলেন বিষ্ণু বিদ্বেষী। এজন্য নানাভাবে হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে বিনাশ করতে চেষ্টা করেন। একবার হস্তিপদতলে একবার অগ্নিকুণ্ডে আবার সাগর

গর্ভে নিক্ষেপ করার পরও যখন প্রহ্লাদের মৃত্যু হয় না, তখন পুত্রকে হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করলেন--কে তাকে বিপদ থেকে বারংবার রক্ষা করে। প্রহ্লাদ উত্তর দিল শ্রী হরি। শ্রী হরি কোথায় থাকেন? প্রহ্লাদ বলে সর্বত্র তিনি বিরাজিত। ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু স্তম্ভকে দেখিয়ে বললেন--এর মধ্যেও কি হরি আছেন? প্রহ্লাদের উত্তর--হ্যাঁ। তখন হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ স্তম্ভকে পদাঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গে এক নৃসিংহ মূর্তি বের হয়ে এল এবং হিরণ্যকশিপুকে বধ করল। তার মৃত্যুর পর প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের রাজা হলেন।

জয় বিজয়-- নারায়ণের দ্বার রক্ষক।

ঐরাবত-- দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তীর নাম ঐরাবত। সমুদ্র মন্থনকালে ঐরাবত উদ্ভুত হয়।

তক্ষক-- অষ্ট নাগের মধ্যে তক্ষক অন্যতম। ইনি নাগরাজ বাসুকির ভ্রাতা এবং অনন্ত নাগ নামেও পরিচিত। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে এর জন্ম। এর বাসস্থান ছিল খাণ্ডব বনে। খাণ্ডব বন দহনকালে তক্ষকের অনুপস্থিতিতে তক্ষকের স্ত্রী পুত্র অর্জুনের শরে বিদ্ধ হয়। ফলে অর্জুনের প্রতি তক্ষক শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ ঋষি শমীকের স্কন্ধে মৃত সর্প নিক্ষেপ করলে শমীকের পুত্র শৃঙ্গী অভিশাপ দেন যে সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে। তক্ষক ফলের ভিতর কীটের মূর্তি ধরে রাজা পরীক্ষিতের কাছে উপস্থিত হলো। পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর জনমেজয় রাজা হন। জনমেজয় পিতার মৃত্যুর কারণ শুনে সর্পকুল বিনাশের জন্য তৈরী হল। পরে বাসুকির ভগিনী মনসার পুত্র আস্তীক তক্ষক ও অন্য সর্পদের রক্ষা করেন।

কদ্রু— সর্প জননী। দক্ষরাজের কন্যা ও কশ্যপ ঋষির স্ত্রী। বিনতা ও দক্ষরাজের কন্যা। বিনতা ও কদ্রু উভয়েই কশ্যপের স্ত্রী ছিলেন। কশ্যপ বর দিতে চাইলে কদ্রু বলশালী সহস্র নাগপুত্র কামনা করেন। আর বিনতা কদ্রুপুত্র অপেক্ষা বলশালী দুই পুত্র কামনা করেন। যথাসময়ে কশ্যপের বরে কদ্রু সহস্র ডিম্ব ও বিনতা দুটি ডিম্ব প্রসব করে। পাঁচশ বৎসর পরে কদ্রুর সহস্র পুত্র জন্ম লাভ করে। আর বিনতার ডিম্ব থেকে কিছু না হওয়ায় তিনি একটি ডিম্ব ভেঙে ফেললে দেখা গেল—সন্তানের উর্দ্ধ অংশ সম্পূর্ণ কিন্তু নিম্ন অংশ অসম্পূর্ণ। সেই অসম্পূর্ণ সন্তান বিনতাকে অভিশাপ দেয় যে এর ফলে তাকে পাঁচশ বৎসর কদ্রুর দাসী হয়ে থাকতে হবে। তারপর অপর ডিম্ব থেকে গরুড়ের জন্ম হল। গরুড় স্বর্গ থেকে অমৃত এনে মাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত করেন।

ঋত্বিক— সাধারণত যজ্ঞে চারজন মুখ্য পুরোহিত নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এদের প্রত্যেকের অধীনে তিনজন করে বার জন ঋত্বিক নিযুক্ত হন। এরা কেউ উচ্চৈঃস্বরে ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করেন, দেবতার প্রশংসা করেন, কেউ যজ্ঞের জিনিসপত্র প্রস্তুত করেন।

জাতের বজ্জাতি কবিতায় মনু, জগন্নাথ, নারায়ণের উল্লেখ আছে।

মনু—ইনি ব্রহ্মার দেহ থেকে উৎপন্ন বলে এর নাম 'স্বায়ম্ভুব' মনু। এর স্ত্রী শতরূপা; পুত্র প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, কন্যা আকুতি, দেবাহুতি, প্রসূতি। এর পুত্রকন্যা হতে মনুষ্য জাতির উদ্ভব। চার সহস্র যুগে এক কল্প হয়—প্রতি কল্পে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। মনু ধর্মশাস্ত্রকার। মনুর সৃষ্ট বলে মানুষের নাম মানব।

জগন্নাথ— বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের অবতার। উড়িষ্যার পুরীতে এর মন্দির আছে।

চরকার গান কবিতায় আছে দ্রৌপদী আর সুদর্শন চক্রের কথা।

দ্রৌপদী-- পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞ বেদী থেকে উদ্ভূত কন্যা দ্রৌপদী। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন। অর্জুন এবং তার অপর চার ভ্রাতা কুন্তীর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘরের বাইরে থেকে বলেছিল--তারা এক অপূর্ব সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন। কুন্তী ঘরের ভিতর থেকেই জবাব দিলেন--তোমরা পাঁচ ভাই মিলে তা ভোগ করতে পার। পরে কুন্তী বাইরে এসে দেখে দ্রৌপদী এক মানবী। কুন্তী বিস্মিত হলেন। তখন মুনি ব্যাসের বিধানমতে পঞ্চ ভ্রাতাই দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদীকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। বিরাট রাজের মহিষী সুদেষ্ণার ভ্রাতা কীচক তাকে অপমান করেন। ভীম এই কীচককে বধ করেন। পাণ্ডবদের পাশা খেলায় হারিয়ে দুর্যোধন দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেন। কর্ণের পরামর্শে তার বস্ত্র হরণ করতে চেষ্টা করেন। কৃষ্ণের কৃপায় দ্রৌপদী সে বিপদ থেকে রক্ষা পায়।

সবিতা-- সবিতা আর সূর্য পৃথক বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সবিতা সূর্যকে চালনা করেন। ইনি পূর্বদিকে উদিত হয়ে দুঃস্বপ্ন, রাক্ষস, পাপ প্রভৃতি দূর করেন। ঋকবেদের ১১টি সূক্তে এর স্তুতি পাওয়া যায়। তিনি তার হিরণ্য খণ্ড দ্বারা সকল প্রাণীকে জাগ্রত ও আশীর্বাদ করেন।

ভাঙ্গার গান কাব্যগ্রন্থে যে সকল কবিতায় পুরাণ প্রসঙ্গ দৃষ্ট হ সেগুলো হচ্ছেঃ জাগরণী, পূর্ণ অভিনন্দন, *ঝোড়ো গান, মোহান্তে মোহঅন্তের গান, 'আশু প্রয়াণ গীতি, দুঃশাসনের রক্তপান* আর *ভাঙ্গা গান। ভাঙ্গার গান'* শীর্ষক কবিতায় আছে পাগলা ভোলা বা শিবে

উল্লেখ। প্রলয়ের অধিকর্তা শিব বা ভোলাকেই কবি আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা কবি এই জেলখানা বা কারাগার ভাঙতে চান। ইংরেজ শাসন ও তার অত্যাচারের প্রতীক এই জেলখানা। রাজনীতিক নেতা ও কর্মী বরিশালের পূর্ণচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাবার জন্য তিনি লিখেছিলেন *পূর্ণ অভিনন্দন*। এই কবিতায় এসেছে ধৃতরাষ্ট্র ও ভীমের প্রসঙ্গ।

ধৃতরাষ্ট্র— পুরু বংশের রাজা শান্তনু ও সত্যবতীর গর্ভজাত দুই সন্তান চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বিকার গর্ভজাত সন্তান হলো ধৃতরাষ্ট্র। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। বিচিত্রবীর্যের অপর স্ত্রীর সন্তান পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন দুঃশাসন নামে শতপুত্র জন্মগ্রহণ করে। ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানেরা কৌরব নামে পরিচিত হন আর পাণ্ডুর সন্তান যুধিষ্ঠির অর্জুন এরা হলেন পাণ্ডব নামে খ্যাত। গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হয়। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হওয়ায় পাণ্ডু সিংহাসন লাভ করে। পাণ্ডবদের শ্রীবৃদ্ধিতে দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। ধ্রতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ ছিলেন। যুদ্ধ, পাশা খেলা, জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি নানা ছলে বলে কৌশলে দুর্যোধন পাণ্ডবদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র পরাজিত হন এবং তার শতপুত্র নিহত হয়।

দুর্যোধন— ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। জন্মের পর দুর্যোধন গর্দভের ন্যায় চিৎকার শুরু করে। ব্রাহ্মণগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেন দুর্যোধন কর্তৃক কুরুবংশ ধ্বংস হবে। অতএব তাকে পরিত্যাগ করাই উত্তম। কিন্তু স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র তা করতে পারেন নি। গদাযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন।

দুঃশাসন— দুর্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের সঙ্গে

পাশা খেলায় ভাই ও দ্রৌপদীকে পণ রেখে পরাজিত হন। তখন দুর্যোধনের উপদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে অপমান করেন এবং প্রকাশ্য রাজসভায় তার বস্ত্র হরণের চেষ্টা করেন। শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করা সম্ভব হয় না। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভীম দুঃশাসনের বুকের রক্ত পান করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। সেই রক্তে দ্রৌপদীর বেশ রঞ্জিত করবেন এমন প্রতিজ্ঞা করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুঃশাসন অভিমন্যুর কাছে পরাজিত হন। ভীম গদাঘাতে দুঃশাসনকে ভূপাতিত করে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্তপান করেন।

এরপর আমরা *সাম্যবাদী* কবিতাগুচ্ছের কথা উল্লেখ করতে পারি। প্রথমে এই *সাম্যবাদী* কবিতাগুচ্ছ *সর্বহারা* কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কবিতাগুচ্ছের নাম থেকেই বুঝা যায় কবি এখানে মানুষে মানুষে পার্থিব যে ভেদাভেদ তাকে স্বীকার করছেন না এবং সব মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা হোক কবি তাই চান। এ সব কবিতার মধ্যেও পৌরাণিক প্রসঙ্গ নানা কারণে ব্যবহার করা হয়েছে। এ সব কবিতায় আছে কৃষ্ণ, বলরাম, ভোলানাথ, গিরিজায়া, সীতা, ঘৃতাচী, দ্রোণ, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, কর্ণ, শান্তনু, সত্যকাম, অহল্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

মানুষ কবিতায় আছে কৃষ্ণ বলরামের প্রসঙ্গ। *বারাঙ্গনা* কবিতায় আছে সীতার কথা আর আছে ঘৃতাচীর প্রসঙ্গ।

ঘৃতাচী-- স্বর্গের অপসরা। মহাভারত অনুযায়ী যে ছয়জন অপসরা শ্রেষ্ঠ তার মধ্যে ঘৃতাচী একজন। বহু ঋষি এই অপসরার প্রতি আসক্ত ছিলেন--যার মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ব্যাস, ভরদ্বাজ, চ্যবন ঋষির পুত্র প্রমতি। ভরদ্বাজ মুনির পুত্র হচ্ছেন দ্রোণাচার্য।

কৃষ্ণ— মানুষ কবিতায় কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণ। গীতায় আছে 'ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যগেযুগে'– কৃষ্ণ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। মথুরার রাজা কংস অতি দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিলেন। তিনি পিতাকে রাজ্যচ্যুত করে নিজে রাজা হন। তাঁর ভগিনী দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসকে হত্যা করবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী শুনে কংস দেবকী ও তার স্বামী বাসুদেবকে কারাগৃহে বন্দী করে রাখেন। কারাগারে দেবকীর ছয়টি সন্তানকে হত্যা করা হয় এবং সপ্তম সন্তান জন্মাবার সময় গর্ভপাত হয়েছে এমন সংবাদ পেলেন কংস। অষ্টম সন্তান জন্মের সময় বাসুদেবকে ভগবান আদেশ করেন যে অষ্টম সন্তানকে যেন গোয়ালা নন্দের স্ত্রী যশোদার কাছে রেখে আসে আর যশোদার কন্যাকে এনে দেবকীকে দেয়। কংস এই কন্যাকেই হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু শিশুকন্যা তখনই আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায়। এবং দৈববাণী হয়-- যে কংসকে হত্যা করবে সে এই রাজ্যেই আছে এবং দিনে দিনে বড় হয়ে উঠছে। বাসুদেবের অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বলরামকেও যশোদার কাছে প্রেরণ করা হয়। মথুরা থেকে নন্দ কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে গোকুলে চলে যান। কংস কৃষ্ণকে খুঁজে না পেয়ে মথুরার যাবতীয় শিশু হত্যা করতে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণকে হত্যা করা সম্ভব হলো না। বরং পুতনা রাক্ষসীকে (যাকে শিশু হত্যার জন্য কংস নিযুক্ত করেছিলেন) মৃত্যু বরণ করতে হলো। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের হাতেই কংসের মৃত্যু হয়। কংস ধনু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে কৌশলে কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে আসেন। কংসের মল্লযোদ্ধাদের কৃষ্ণ হত্যা করেন। কংস ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে নির্বাসনের আদেশ দেন। নন্দ ও বাসুদেবের হত্যার আদেশ দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ কংসকে আক্রমণ করেন এবং তাকে সিংহাসন থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন। অত্যাচারীকে দমন করার জন্যই কৃষ্ণের আবির্ভাব।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-- ব্যাসদেবের নাম। পরাশর মুনির ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভজাত পুত্র হচ্ছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। দাসরাজ বসু এই মৎস্যগন্ধাকে প্রতিপালন করেন। তখন তার নাম হয় সত্যবতী। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সত্যবতীর আজ্ঞায় তপস্যায় বড় হন এবং বেদ বিভক্ত করে বেদব্যাস নামে খ্যাত হন। ইনি মহাভারতেরও রচয়িতা। শুক ও বৈশম্পায়ন এর পুত্র। পরে মহারাজ শান্তনু দ্বৈপায়ন-জননী সত্যবতীকে বিবাহ করেন।

সত্যকাম-- জবালার পুত্র। যৌবনে জবালা বহুচারিণী ছিলেন। সেই সময় তার গর্ভে সত্যকামের জন্ম। মহর্ষি গৌতমের কাছে সত্যকাম বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য গেলেন; কিন্তু মহর্ষি তার গোত্র পরিচয় জানতে চাইলেন। সত্যকাম তার জননী জবালাকে সব জিজ্ঞাসা করেন এবং গোত্রহীনতার রহস্য তিনি মহর্ষি গৌতমকে বলে দেন। মহর্ষি গৌতম তার সত্যবাদিতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণের মর্যাদা দেন।

অহল্যা-- ব্রহ্মার মানস কন্যা। 'হল' শব্দের অর্থ কদর্যতা। সকল প্রকার কদর্যতা মুক্ত বলে ব্রহ্মা এর নাম রাখেন অহল্যা। অহল্যাকে অনেক দিন ব্রহ্মা গৌতম ঋষির কাছে রেখে দিয়েছিলেন। সংযতচিত্ত গৌতম অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অহল্যার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে অহল্যাকে গৌতমের হস্তে সম্প্রদান করেন।

গৌতমের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র গৌতমের আকৃতি ধারণ করে অহল্যার সঙ্গে মিলিত হন। গৌতম এই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন, তিনি নপুংসক হবেন। গৌতম অহল্যাকেও অভিশাপ দেন যে-- সে সহস্র বৎসর দেহহীন রূপহীন

অবস্থায় অনুতপ্ত হৃদয়ে এখানে অবস্থান করবে। রামচন্দ্র এই অরণে পদার্পণ করলে তাঁর সেবা করে অহল্যা শাপমুক্ত হবে।

ভীষ্ম-- রাজা শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে এর জন্ম। সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনুর বিবাহে সিংহাসন ত্যাগ ও আমরণ ব্রহ্মচর্য গ্রহণ--এই দুই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কারণে তিনি ভীষ্ম নামে খ্যাত হন।

দ্রোণ-- মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। দ্রোণের পুত্র অশ্বথামা। পরশুরামের শিষ্য। দ্রৌণ কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা দেন। পুত্রে মৃত্যু সংবাদ শুনে ইনি শোকার্ত হন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন তাকে হত্যা করেন।

কর্ণ-- কুন্তীভোজের পালিত কন্যা কুন্তীর পুত্র। ঋষি দুর্বাসা কুন্তীর গৃহে এলে কুন্তী তাকে পরিচর্যা করেন। ঋষি দুর্বাসা তুষ্ট হয়ে তাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দেন। মন্ত্রের বলে যে দেবতাকে আহবান করবেন তার প্রসাদে পুত্র লাভ হবে। কুন্তী সূর্যকে আহবান করলে--সূর্যের ঔরসে কর্ণের জন্ম হয়। কিন্তু সূর্য বলে যায় এতে তার কুমারীত্ব বিনষ্ট হবে না। কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী সদ্যোজাত পুত্রকে একটি পাত্রে ভরে জলে ভাসিয়ে দেয়। অধিরথের স্ত্রী রাধা এই কর্ণকে পালন করেন--পরে পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহ হয়। যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য পাণ্ডবদের জন্মদায়িনী কুন্তী। কর্ণ পাণ্ডবদের ভ্রাতা। কর্ণ দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেন। ইনি নিজের অঙ্গ কর্তন করে ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল দান করায় কর্ণ নামে খ্যাত হন। কর্ণের জীবন বিচিত্র, বহুযুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে পরস্পর বিরোধী চরিত্র গুণ লক্ষ্য করা যায়।

ফণিমনসা কাব্যের *সব্যসাচী* ও অন্যান্য কবিতায়ও পুরাণ প্রসঙ্গ এসেছে। *দ্বীপান্তরের বন্দিনী* কবিতার একটি সুন্দর চিত্রকল্প উল্লেখ

করার মতো। ''যথা বন্দিনী সীতাসম বাণী সহিছে বিচার-চেড়ীর মার।'' সীতার সঙ্গে বাণীর অভেদ কল্পনা একটি চমৎকার চিত্রকল্প। একটি আশ্চর্যসুন্দর রূপক। বিচার আর চেড়ীর অভেদ কল্পনা একটি ব্যতিক্রমী রূপক। এই কাব্যেও অর্জুন, সব্যসাচী, গাণ্ডীব, কংস, সীতা প্রসঙ্গ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্জুন— তৃতীয় পাণ্ডব। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বীর। ইনি প্রথমে কৃপাচার্য পরে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। ইনি উভয় হস্তে শর সন্ধান করতে পারতেন বলে তার নাম সব্যসাচী। পৃথার (কুন্তী) সন্তান বলে তার নাম পার্থ। তার ধনুর নাম গাণ্ডীব।

দধীচি— এর আত্মত্যাগের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

সিন্ধু হিন্দোল কাব্যটি প্রকৃতির পটভূমিকায় রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। *সিন্ধু হিন্দোল* শীর্ষক কবিতাবলীতে শিব, বারুণী, ইন্দ্রনীল-কান্তমণি, মৎস্যকুমারী, মন্থন মন্দর, উচ্চৈঃশ্রবা ও কল্পতরুর প্রসঙ্গ এ কাব্যটিকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। অবশ্য সমুদ্র মন্থনের কথা আছে বলেই এই কবিতাগুচ্ছে উচ্চৈঃশ্রবা, মৎস্য কুমারী, মন্থন মন্দার-এর চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। উচ্চৈঃশ্রবার প্রসঙ্গ বিদ্রোহী কবিতায়ও আছে। এটি হচ্ছে সমুদ্র থেকে উদ্ভূত এক শ্বেত অশ্ব। এটি ইন্দ্রের অশ্ব, অমৃত পান করতো এবং একে অশ্বদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়।

মন্দর— দেবতা ও অসুররা মিলিত হয়ে যখন সমুদ্র মন্থন করেন তখন এই পর্বতকে মন্থন দণ্ড করা হয়। এই পর্বত একাদশ সহস্র যোজন প্রোথিত ছিল।

সমুদ্র মন্থন— সত্যযুগে দেবতা ও অসুররা ঠিক করলেন, তারা

অমৃত পান করে অজর অমর হবেন। অমৃত লাভের আশায় মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন শুরু করেন। সহস্র বৎসর মন্থনের পরেও যখন অমৃত পাওয়া গেল না তখন বাসুকি বিষ উদ্গীরণ করতে থাকে। তখন মহাদেব এই বিষ পান করেন বলে তার কণ্ঠ নীল হয়ে যায়। মহাদেবের 'নীলকণ্ঠ' নামের কারণ এই। আরও সহস্র বৎসর মন্থনের পর ধন্বন্তরীর আবির্ভাব হয়। তারপর সবশেষে উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভ মণি ও অমৃত উত্থিত হলো। তখন অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হয়। তখন বিষ্ণু অমৃত হরণ করেন এবং অসুররা পরাজিত হয়।

জতুগৃহের প্রসঙ্গ এসেছে *দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার মঞ্জীর* কবিতায়। দুর্যোধনের চক্রান্তে বারণাবত নগরে একটি গৃহ নির্মিত হয়েছিল। এই গৃহ নির্মিত হয় নানারকমের দাহ্য বস্তু দিয়ে। সেখানে পাণ্ডবদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। দুর্যোধনের মন্ত্রী পুরোচন গোপনে এই গৃহে অগ্নিসংযোগ করবেন এমন চক্রান্ত করা হয়। বিদুর আগে থেকেই যুধিষ্ঠিরকে এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেয়। এক বৎসর বাস করার পর কুন্তী ব্রাহ্মণ ও অন্যদের নিমন্ত্রণ করেন এবং গভীর রাতে পাণ্ডবেরাই গৃহে আগুন লাগিয়ে গোপনে সুড়ঙ্গপথ দিয়ে পালিয়ে যায়। জতুগৃহে পুরোচন ও একজন মাহুত তার পাঁচপুত্রসহ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। তখন রটনা হয় যে পাণ্ডবেরাই জতুগৃহে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে।

কালপুরুষ-- *চাঁদনী রাতে* কবিতায় আছে কালপুরুষের প্রসঙ্গ। কালপুরুষ যমের অন্য নাম। ইনি ব্রহ্মার পুত্র--সূর্যের পৌত্র। ইনি তাপস বেশে একদিন রামের কাছে এসে তাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে যান। নিভৃতে তিনি নিজমূর্তি ধারণ করে বলেন যে ব্রহ্মা তাকে অনুরোধ করেছেন বৈকুণ্ঠে যেতে। রামকে তিনি এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

করেন যে তাদের কথোপকথনের সময় যে সম্মুখে উপস্থিত হবে রাম তাকেই বর্জন করবেন। সেই সময় লক্ষ্মণ রামের দ্বার রক্ষক ছিলেন। এমন সময় দুর্বাসা রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। দুর্বাসার শাপের ভয়ে লক্ষ্মণ রামকে সংবাদ দেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাম লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করেন। লক্ষ্মণ দীর্ঘদিন সরযু নদীর তীরে যোগ সাধনা করেন। পরে ইন্দ্র তাকে স্বর্গে নিয়ে যায়।

চক্রবাক কাব্যও প্রকৃতি বিষয়ক গ্রন্থ। সেখানেও নানাভাবে পুরাণ প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। *কর্ণফুলী* কবিতায় আছে চিত্রকূট, যক্ষ, দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, মহাশ্বেতা, পুণ্ডরীক প্রসঙ্গ। আসলে এই কাব্যে প্রেম ও বিরহই হচ্ছে প্রধান বিষয়বস্তু। বিরহ বুঝাবার জন্য যক্ষ ও শকুন্তলার প্রসঙ্গ। বিরহী যক্ষের কথা মেঘদূত কাব্য থেকে নেওয়া।

যক্ষ— এরা কুবেরের অনুচর। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত থাকার সময় অতিশয় ক্ষুধার্ত হন এবং ক্রোধের বশে অন্ধকারের মধ্যেই প্রজা সৃষ্টি করতে থাকেন। এর ফলে অন্ধকারের মধ্যে বিকৃতরূপ, ক্ষুধার্ত প্রজার সৃষ্টি হলো। তাদের মধ্যে কেউ ক্ষুধার্ত হয়ে ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়। তারাই যক্ষ। আর যারা নিষেধ করেছিল রাক্ষস। যক্ষরা কুবেরের ভৃত্য, মানুষের বন্ধু, রাক্ষসেরা মানুষের শত্রু।

দুষ্মন্ত— পুরু বংশের একজন বিখ্যাত রাজা। মৃগয়াকালে কন্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার ফলে রাজা তার প্রতি আসক্ত হন এবং গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেন। তারপর রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে। কিছুদিন পরে শকুন্তলার ভরত নামে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করাবেন এই প্রতিজ্ঞা

করেছিলেন দুষ্মন্ত। শকুন্তলা পুত্রসহ রাজপ্রাসাদে গেলে রাজা শকুন্তলাকে আদৌ চিনতে পারলেন না। এদিকে রাজা বিদায় কালে শকুন্তলাকে রাজ-পরিচায়ক যে আংটি দিয়ে গিয়েছিলেন তা হারিয়ে যাওয়াতে শকুন্তলা যে তার স্ত্রী সে কথার কোন প্রমাণ দিতে পারলেন না। শকুন্তলা যখন প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাজসভা থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন তখনই দৈববাণী হয়, শকুন্তলার পুত্রের পিতা দুষ্মন্ত। শেষ পর্যন্ত রাজা ভরতকে গ্রহণ করেন এবং অবশেষে ঐ আংটিও মৎস্যের উদরে পাওয়া গেলে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন হয়।

মেঘদূত কাব্যের বিষয় হচ্ছে যক্ষের শাস্তি; এক বৎসর অজ্ঞাতবাস এবং যক্ষিণীর কাছ থেকে দূরে থাকা এবং অভিশাপগ্রস্ত যক্ষের বিরহ বেদনার অপূর্ব বর্ণনা । বিরহের বর্ণনা দিতে গেলে যে কোন কবিই এই যক্ষের উল্লেখ করেন এবং মেঘদূতের খ্যাতিই বিরহ কাব্য হিসাবে।

চিত্তনামা কাব্যগ্রন্থে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণের কথা আছে। *ইন্দ্রপতন* কবিতায় পুরাণ প্রসঙ্গের বহুল ব্যবহার এই কবিতাটিকে এক অসামান্য গৌরব দান করেছে। আসলে দেশবন্ধুর মত ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাবার জন্যই কবি এতগুলি উপমা ও রূপকের সাহায্য নিয়েছেন। দেশবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বুঝাতে গিয়ে কবি স্বর্গ মর্ত্য পাতালের যাবতীয় প্রসঙ্গকে ব্যবহার করেছেন।

অর্ঘ্য কবিতায় নীলকণ্ঠের উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। আর *সান্ত্বনা'*কবিতায় আছে বাসুদেব, কেশব (কৃষ্ণ), যশোদা আর শিবের প্রসঙ্গ। ইন্দ্রপতন কবিতায় আছে নারায়ণ, শঙ্খ চক্র গদা, বাসুকি,

ভৃগু, বিষ্ণু, যশোদা দুলাল (কৃষ্ণ), হরিশ্চন্দ্র দাতাকর্ণ, জননী (স্বর্ণসীতা), বিশ্বামিত্র, যুধিষ্ঠির, সব্যসাচী, গিরিরাজ হিমালয় প্রসঙ্গ।

কর্ণ— কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণ কর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎপূর্বক তাঁর জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত করান এবং বলেন যে, তিনি পাণ্ডবদের এবং ধর্মানুসারে পাণ্ডুরই পুত্র। অতএব তিনি রাজত্বভার গ্রহণ করে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর সেবা নিতে পারেন। কর্ণ এই কথা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তিনি কুন্তী কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং অধিরথকেই পিতা বলে মনে করেন। দুর্যোধনের আশ্রয়ে থাকার জন্য তিনি তার বিরুদ্ধাচার করতে পারেন না। কর্ণ কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন যে এই কথা যেন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে না বলেন। কেননা কর্ণকে বড় ভাই হিসাবে জানতে পারলে যুধিষ্ঠির কোন কালে রাজ্যভার গ্রহণ করবেন না। অতএব কৃষ্ণ ও অর্জুনের সহায়তায় তিনি রাজ্যলাভ করুক এই তার অভিপ্রায়।

হরিশ্চন্দ্র— সূর্য বংশের রাজা। স্ত্রীর নাম শৈব। পুত্রের নাম রোহিতাশ্ব। ইনি ধ্যান ও ন্যায় বিচারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র একদিন মৃগয়ায় গিয়ে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পান। এই আর্তনাদ ছিল সিদ্ধি স্বরূপিনী দেবীর। যাকে আয়ত্ত করার জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপস্যা করছিলেন। হরিশ্চন্দ্র তাকে রক্ষা করতে গেলে বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। পরে বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের কাছে দান চাইলেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যা প্রাপ্য তাই। হরিশ্চন্দ্র তাতে সম্মত হলেন। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের কাছ থেকে সবই নিয়ে নিলেন শুধু অবশিষ্ট রইলো স্ত্রী ও পুত্র, তার পরিধেয় বল্কল। হরিশ্চন্দ্র কাশীতে চলে গেলেন কিন্তু বিশ্বামিত্র তার পিছু নিলেন। হরিশ্চন্দ্র তখন তার স্ত্রী পুত্রকে এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রয় করলেন। শেষে হরিশ্চন্দ্র

নিজেকে এক চণ্ডালের কাছে বিক্রয় করলেন। সেই অর্থ তিনি বিশ্বামিত্রকে দিলেন। চণ্ডালের দাস হয়ে হরিশ্চন্দ্র এক বৎসর কাটালেন। পুত্র রোহিতাশ্ব সর্পাঘাতে মৃত্যুবরণ করে এবং শৈব্যা তাকে শ্মাশানে নিয়ে যায়। সেখানে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা পরস্পরকে চিনতে পারে। তখন তারা দুজনেই পুত্রের চিতায় আত্মবিসর্জন দিবেন বলে স্থির করেন। তবে হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের দাস বলে তার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত ধর্ম ও বিশ্বামিত্র শ্মাশানে উপস্থিত হন। দেবতাদের আশীর্বাদে রোহিতাশ্ব পুনরায় জীবিত হলেন। হরিশ্চন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পরে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে স্বর্গে গমন করেন।

যুধিষ্ঠির— পাণ্ডবদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। কুন্তীর গর্ভে ধর্মের ঔরসে এর জন্ম। এজন্য তিনি ধর্মপুত্র নামে খ্যাত। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর কুন্তী ও পঞ্চ পাণ্ডব হস্তিনাপুরে এসে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়। কৃপ ও দ্রোণের কাছে কৌরবদের সঙ্গে তিনিও অস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাতে দুর্যোধন অসন্তুষ্ট হন। তখন থেকে দুর্যোধন পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির জয়লাভ করেন। যুধিষ্ঠির মহাপ্রয়াণের পথে যাত্রা করলেন। পথে চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদী মৃত্যুমুখে পতিত হন। শুধু একটি কুকুর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী ছিলেন। ইন্দ্র তাকে কুকুরসহ স্বর্গে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাতে রাজী হননি। তখন কুকুর রূপী ধর্ম নিজ মূর্তি ধারণ করেন এবং বললেন, স্বর্গে যাবার যোগ্যতম ব্যক্তি হচ্ছেন যুধিষ্ঠির।

নজরুল ইসলামের প্রায় সব কাব্যেই পুরাণের এমন সুপ্রয়োগ দেখে বিস্মিত হতে হয়। একজন মুসলমান কবি যে হিন্দু পুরাণের

এতসব প্রসঙ্গকে সার্থকভাবে তাঁর কাব্যে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন তা ভাবলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়। এতে এই কবির প্রতিভা ও শক্তিমত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ করি কোন হিন্দু কবিও তাঁর কাব্যে এত সার্থকভাবে এত অধিক পরিমাণে পুরাণের ব্যবহার করতে পারেন নি।

বাংলা কাব্য সাহিত্যে নজরুল ইসলামের এই অবদান ও কৃতিত্ব অসাধারণ বলে বিবেচিত হতে পারে। বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য, যথার্থ করার জন্য নজরুল ইসলাম পুরাণের এই সব প্রসঙ্গকে সার্থক ভাবে ব্যবহার করেছেন যেমন ইংরেজী কবিতায় করেছিলেন টি.এস. এলিয়ট। জীবনের সংকটকে জীবনের সমস্যাকে চিত্রিত করবার জন্য এলিয়ট যে কোন পৌরাণিক প্রসঙ্গের কাছে হাত পেতেছেন--খ্রীষ্টান বৌদ্ধ বা গ্রীক বা অন্য যে কোন ঐতিহ্যের কাছে। নজরুল ইসলামও তেমনি ব্যবহার করেছেন ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যকে, মুসলিম বা প্রাক্ মুসলিম ঐতিহ্যের পাশাপাশি।